শেখ রাসেল সারা বিশ্বের নিপীড়িত, নিষ্পেষিত এবং নিষ্ঠুরতার শিকার এমন শিশু-কিশোরের প্রতিচ্ছবি।

আল ফয়সাল

এ বছর রাসেলের বয়স ৫৮ বছর হল। কিন্তু তাকে দেখতে এখনো দশ বছর বালকের মত। সে যেন চির কিশোর। কৈশোরের প্রাণ চাঞ্চল্য শান্ত সৌম্য ভাব তার অবয়বে। বড় হয়ে সে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিল। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে দেশ মাতৃকা রক্ষায়, এই বয়সেই তার কাছে মনে হয়েছিল সেনাবাহিনী হচ্ছে তার কাজের প্রকৃত জায়গা। ঘাতকের বুলেট যদি সেদিন তার প্রাণ কেড়ে না নিতো তাহলে আজ হয়তো আমরা পেতাম একজন কর্মবীর দেশপ্রেমিক কে। আজকে যে আমরা দেশ নিয়ে এত এত সমস্যার কথা বলি তার সমস্ত সমাধান হয়তো ছিল তার কাছে ।

বাংলাদেশের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল। পরিবারের সবার ছোট হওয়ায় তিনি ছিলেন অতি আদরের, যেন সোনার পুতুল। ধানমন্ডির বাড়িতে ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর তার জন্ম। তার জন্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে আজকের বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মৃতিচারণ করেন এভাবে-'রাসেলের জন্মের আগের মুহূর্তগুলো ছিল ভীষণ উৎকণ্ঠার। আমি, কামাল, জামাল, রেহানা ও খোকা চাচার বাসায়। বড় ফুফু ও মেজো ফুফু মার সাথে। একজন ডাক্তার, সাথে নার্সও এসেছেন। সময় যেন আর কাটে না। জামাল আর রেহানা কিছুক্ষণ ঘুমায় আবার জেগে ওঠে। আমরা ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে জেগে আছি নতুন অতিথির আগমন বার্তা শোনার অপেক্ষায়। মেজো ফুফু ঘর থেকে বের হয়ে এসে খবর দিলেন আমাদের ভাই হয়েছে। খুশিতে আমরা আত্মহারা। কতক্ষণে দেখব। ফুফু বললেন, তিনি ডাকবেন। কিছুক্ষণ পর ডাক এলো। বড় ফুফু আমার কোলে তুলে দিলেন রাসেলকে। মাথাভরা ঘন কালো চুল। তুলতুলে নরম গাল। বেশ বড় সড় হয়েছিল রাসেল'। তার জন্মের পর জাতির পিতা পরম মমতায় চুমু খেয়ে তাকে স্থান দিলেন তার বুকে। তিনি উচ্চারণ করলেন 'ওর নাম হবে শেখ রাসেল'। অবশ্য এতে বেগম মুজিবেরও ভূমিকা ছিল। বার্ট্রান্ড ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রিয়। ওই সময় রাসেলের একটি গ্রন্থ ছিল তার কারাগারের প্রিয় সঙ্গী। বার্ট্রান্ড রাসেল শুধু একজন দার্শনিকই ছিলেন না, ছিলেন বিজ্ঞানীও। পারমাণবিক যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের একজন বড় মাপের বিশ্ব নেতাও।

শিশু রাসেলের জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কেটেছে বাবা মুজিবকে ছাড়া। কারণ, বাবা মুজিব রাজনৈতিক বন্দি হয়ে কারাগারে ছিলেন দিনের পর দিন। আর চোখের সামনে বাবাকে দেখতে না পেয়ে মা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে একপর্যায় 'আব্বা' বলেই সম্বোধন করতে লাগলেন। এই বিষয়ে শেখ হাসিনা বক্তৃতায় বলেন, 'যখন সে আব্বা বলে ডাকত তখন মা বলতো, আমি তোমার আব্বা। আমাকেই আব্বা ডাকো। সেই জন্যই সে জেলখানায় গিয়ে আব্বাকেও আব্বা বলে ডাকতো, আম্মাকেও আব্বা বলে ডাকতো'।

'কারাগারের রোজনামচা'য় শেখ রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, '৮ ফেব্রুয়ারি ২ বছরের ছেলেটা এসে বলে, আব্বা বাড়ি চলো'। কী উত্তর ওকে আমি দিব। ওকে ভোলাতে চেষ্টা করলাম ওতো বোঝে না আমি কারাবন্দি। ওকে বললাম, 'তোমার মার বাড়ি তুমি যাও। আমি আমার বাড়ি থাকি। আবার আমাকে দেখতে এসো'। ও কি বুঝতে চায়! কী করে নিয়ে যাবে এই ছোট্ট ছেলেটা, ওর দুর্বল হাত দিয়ে মুক্ত করে এই পাষাণ প্রাচীর থেকে! দুঃখ আমার লেগেছে। শত হলেও আমি তো মানুষ আর ওর জন্মদাতা। অন্য ছেলে-মেয়েরা বুঝতে শিখেছে। কিন্তু রাসেল এখনো বুঝতে শিখেনি। তাই মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেতে চায় বাড়িতে'।

কারগারের রোজনামচায় ১৯৬৭ সালের ১৪-১৫ এপ্রিলের অন্যান্য প্রসঙ্গ ছাড়াও রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "জেল গেটে যখন উপস্থিত হলাম ছোট ছেলেটা আজ আর বাইরে এসে দাঁড়াইয়া নাই দেখে আশ্চর্যই হলাম। আমি যখন রুমের ভিতর যেয়ে ওকে কোলে করলাম আমার গলা ধরে 'আব্বা' 'আব্বা' করে কয়েকবার ডাক দিয়ে ওর মার কোলে যেয়ে 'আব্বা' 'আব্বা' করে ডাকতে শুরু করল। ওর মাকে 'আব্বা' বলে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কী?' ওর মা বলল,"বাড়িতে 'আব্বা' 'আব্বা' করে কাঁদে তাই ওকে বলেছি আমাকে 'আব্বা' বলে ডাকতে"। রাসেল 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকতে লাগল। যেই আমি জবাব দেই সেই ওর মার গলা ধরে বলে, 'তুমি আমার আব্বা'। আমার উপর অভিমান করেছে বলে মনে হয়। এখন আর বিদায়ের সময় আমাকে নিয়ে যেতে চায় না।"

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় রাসেল মা ও বোনদের সঙ্গে বন্দি হয়ে ছিল ধানমন্ডি ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে। বড় দু'ভাই শেখ কামাল ও শেখ জামাল মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। রাসেল মা-বোনদের সঙ্গে নিঃসঙ্গ হয়ে ঘরের ভিতর বন্দি জীবন কাটিয়েছে। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরও তারা বন্দি ছিল। বাইরে তখন বিজয়-উৎসব চলছে। ১৭ ডিসেম্বর তারা বন্দিমুক্ত হলে রাসেল 'জয় বাংলা' বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

১৫ আগস্ট, ১৯৭৫। ১০ বছরের রাসেল ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র । রাসেলের ঘুম ভেঙ্গে যায় সেদিন গুলির শব্দে, হইচইতে। মা তাকে পেছনের দরজা দিয়ে কাজের লোকজনের হাতে নিচে পাঠিয়ে দেন। ১০ বছরের রাসেল হঠাৎ ঘুমভাঙ্গা চোখ নিয়ে সব দেখেছে, আর আতঙ্কভরা মন নিয়ে সবকটা গুলির শব্দ শুনেছে। তারপর ঘাতকরা তার হাত ধরে, অস্ত্র তাক করে। রাসেল কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, 'আমি মায়ের কাছে যাব। আমি মায়ের কাছে যাব।'

ঘাতক ওয়্যারলেসে অনুমতি নিয়েছে তাকে হত্যা করার। শেখ রাসেল বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র-এই ছিল তার অপরাধ। রাসেলকে হত্যার মধ্য দিয়ে ঘাতকরা জাতির পিতার রক্তের উত্তরাধিকার নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। ঘাতকরা তার হাত ধরে বড়ভাই শেখ কামাল, চাচা শেখ আবু নাসের, স্নেহময় পিতা শেখ মুজিব, মমতাময়ী মা, ভাই শেখ জামাল, সদ্যপরিণীতা ভাবী সুলতানা ও রোজী সবার রক্তাক্ত দেহ দেখাল। রাসেল কেমন করে দেখেছিল সেই প্রাণহীন প্রিয়জনদের? সেই রক্তভেজা মেঝেতে হাঁটতে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল কী হাহাকারে? রাসেলকে ঘাতকরা কেন এই রক্তাক্ত দেহগুলো দেখিয়েছিল? তার শুদ্ধতম ছোট্ট হৃদয়কে তারা কেন কষ্ট দিয়েছিল? কেন যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত করেছিল? ছোট্ট রাসেল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদঁতে কাঁদতে শেষবার উচ্চারণ করেছিল, 'আমাকে আমার হাসু আপার কাছে পাঠিয়ে দিন!'

ঘাতক-নরপিশাচ ঘাতকরা ছোট্ট রাসেলের সে কান্নাভেজা কথা শোনেনি, হৃদয়ের আকুতি শোনেনি। তারা বুলেটে বুলেটে শিশু রাসেলকে হত্যা করেছে। ছোট্ট রাসেল কাঁদতে কাঁদতে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে গেছে।

সেই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ঘাতকরা ইন্ডিমিনিটি জারি করে বিচারের পথ রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। সেই ঘাতকদের বিচার বাংলাদেশের মাটিতে হয়েছে, অনেকের সাজা কার্যকর হয়েছে। এখনো যাদের সাজা কার্যকর হয়নি তাদের বাংলার মাটিতে এনে বিচার কার্যকর করার মাধ্যমে জাতির পিতা এবং তার পরিবারের হত্যার কলঙ্ক থেকে এই জাতি মুক্ত হবে বলে আশা করি।

নির্মম সেই হত্যাকাণ্ডের অনেক বছর পর শেখ রাসেলের জন্মদিন স্বীকৃতি পেল জাতীয় দিবস হিসেবে। ২৩ আগস্ট ২০২১ মন্ত্রিসভা বৈঠকে শেখ রাসেলের জন্মদিনটি 'শেখ রাসেল দিবস' হিসাবে জাতীয়ভাবে পালনের অনুমোদন দেয়া হয় এবং 'ক' শ্রেণীভুক্ত করে পালনের স্বীকৃতি গৃহীত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৮ অক্টোবর ২০২২ জাতীয় বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা পর্যায় এ বছর দিবসটি নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে। দিবসের এবছরের প্রতিপাদ্য 'শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক'। দিবসটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ১-স্মৃতি বিজড়িত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এর শোকাবহ ইতিহাস সম্পর্কে সারাদেশের লাখো ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা তরুণ-তরুণীসহ সাধারণ জনগণের নিকট উপস্থাপন ও অবহিতকরণ। ২-আজকের শিশুরাই আগামী দিনের উন্নত বাংলাদেশকে পরিচালিত করবে ও নেতৃত্ব দিবে, তাদেরকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিতকরণ। ৩-প্রিয় শেখ রাসেলকে হৃদয়ের মনিকোঠায় লালন। ৪-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে শিশু শেখ রাসেলের স্মৃতিময় আলেখ্য, তার দৃঢ়চেতা মনোভাব ও অপরিসীম সাহসিকতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধু'র আদর্শ ধারণ। ৫-শেখ রাসেলের দীপ্ত প্রত্যয়কে হৃদয়ে ধারণ এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়ার শক্তিতে বলিয়ান করা। ৫-শিক্ষা, সাহিত্য, তথ্য-প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা এবং স্বাস্থ্য খাতে স্মৃতি জাগনিয়া।

শেখ রাসেল সারা বিশ্বের নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, ভাগ্যবিড়ম্বিত এবং নিষ্ঠুরতার শিকার সকল শিশু-কিশোরের প্রতিচ্ছবি। শেখ রাসেলের সকল স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যমে আমাদের আগামী দিনের শপথ হোক শেখ রাসেলের মত যেন কোন শিশুই আর নির্মমতার শিকার না হয়। উন্নত বাংলাদেশের যে স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে দেখিয়েছেন সে দেশে যেন প্রতিটি শিশু তার অধিকার সমানভাবে পায়। কোন নিষ্ঠুরতার শিকার যেন তারা কখনো না হয়। সকল শিশুকে পৃথিবীর বাসযোগ্য করে যাব আমরা । এই যেন হয় আমাদের অঙ্গীকার।

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ।